ক্ষুদ্রঋণ-বাজার সু-ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্য পথ ও নীতি-সংস্কার

সাজ্জাদ জহির*
৭ই নভেম্বর, ২০১০, ঢাকা

প্রারম্ভিক

ক্ষুদ্রঋণ-বাজারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে নীতি-নির্ধারক পর্যায়ে বেশ কিছু বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। এসবের মাঝে দুটো উল্লেখ্যঃ সর্বোচ্চ সুদের হার বেঁধে দেয়া ও ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থা থেকে গ্রামীণ বা আঞ্চলিক ব্যাংক-এ উন্নীত হবার ক্ষেত্র তৈরী করা। আপাতঃদৃষ্টিতে পৃথক মনে হলেও বিষয় দুটোর মাঝে যোগসূত্রতা রয়েছে এবং সেকারণেই একত্রে আলোচনা করা হলো।

সকলেই স্বীকার করেন যে উভয় এন,জি,ও এবং ক্ষুদ্রঋণ খাতের বিকাশ পরিচ্ছন্ন আইনী পথে চলেনি। অথবা, আইনী তদারকী না থাকায় এই খাত বিকাশের সুযোগ পেয়েছিল। 'অনিয়ম'-এর দুটো দিকের সাথেই আমরা পরিচিত - একদিকে নিয়ম-শৃংখলার অনুপস্থিতিতে দূরবর্তী স্থানে ঋণ সরবরাহের উদ্ভাবনী ব্যবস্থা প্রসারের সুযোগ ঘটে; অপরদিকে, তদারকীর অভাবে সঞ্চয়ের নামে গরীবের অর্থ আত্মসাতের দৃষ্টান্তও রয়েছে। তবে, সহজলভ্য অর্থে দারিদ্র্য-বিমোচনের নিমিত্তে হোক, অথবা ঋণ-ব্যবসার কারণেই হোক, ক্ষুদ্রঋণ-কর্মসূচীর আওতায় এদেশে স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে অসংখ্য সংস্থা গড়ে উঠেছে। এসব সংস্থায় অনেকের কর্ম-সংস্থান হয়েছে, এমনকি অর্জিত পুঁজি কোনকোন ক্ষেত্রে বিশাল আকার লাভ করে অন্যান্য বাণিজ্যিক অঙ্গণে প্রসারিত হয়েছে এবং কিছুকিছু ক্ষেত্রে তা আন্তর্জাতিক রুপ নিয়েছে।

উল্লেখিত বিকাশ ধারায় মাঝেমধ্যে কয়েকটি বিষয়ে বিতর্ক উঠেছে। যেমন, এসব সংস্থা কি কেবলই দারিদ্র্য-বিমোচনের কাজে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখবে, না কি তাদের বাণিজ্যিক কর্মকান্ডও সহজভাবে গণ্য করা হবে? এর সাথে জড়িত রয়েছে অপর একটি প্রশ্নঃ দারিদ্র্য-বিমোচনে জড়িত বিধায় এসব সংস্থা কি রাজস্ব কর-জালের আওতার বাইরে থাকবে, না কি আর পাঁচটি বাণিজ্যিক সংস্থার মত এদেরও কর দেয়া বাধ্যতামূলক করা উচিত? যদি দারিদ্র্য-বিমোচনই মূখ্য উদ্দেশ্য হয়, ক্ষুদ্রঋণ-এর সুদের হার 'মাত্রাতিরিক্ত' হওয়া উচিত কি? না কি, খরচ ও স্বাভাবিক মার্জিন বিবেচনায় এনে সর্বোচ্চ সুদের হার বেঁধে দেয়া উচিত? ক্ষুদ্রঋণ-ভিত্তিক বাণিজ্যিক বিকাশ-ধারাকে কেন্দ্র করে অপর একটি প্রশ্ন বহুদিন সংস্কার প্রস্তাবনায় উত্থাপিত হলেও ফাইল-বদ্ধ হয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে। ক্ষুদ্রঋণ-কে কেন্দ্র করে যে সংস্থাগুলো গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যকার যোগ্যদের গ্রামীণ ও আঞ্চলিক ব্যাংক-এ উন্নীত করার প্রস্তাব উঠেছে। অনেকে মনে করেন যে এ প্রস্তাব কার্যকর হলে এসব সংস্থা আইনানুগভাবে জমা গ্রহণ নিয়ে মূলধণের সংকট মেটাতে পারে। এর বিপরীতে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ-ব্যবসার প্রসার ঘটানোর কথা কোনও কোনও আন্তর্জাতিক সংস্থা জোরেসোরে প্রচার করে। এই ধারার প্রবক্তারা মনে করে যে, ক্ষুদ্রঋণ কর্মকান্ড বিকশিত হয়ে একপর্যায়ে মূল বাণিজ্যিক ব্যাংকিং ধারার সাথে সম্পৃক্ত হবে — অর্থাৎ, প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক-ভিত্তিক ঋণের সাথে যেন ক্ষুদ্রঋণের কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই। নীতি-পর্যায়ে এসব বিকল্প ভাবনার ভালো-মন্দ দিক আলোচনা করে কিছু প্রস্তাবনা রাখাই এ নিবন্ধের মূখ্য উদ্দেশ্য।

শুরুতেই একমত হওয়া প্রয়োজন যে ঋণ (দেয়া) অর্থনীতির ভাষায় একধরণের সেবা, যা সরবরাহ করতে খরচ লাগে এবং যেটা পাবার জন্য ঋণ-গ্রহীতা দাম দিতে আগ্রহী। অর্থাৎ, সুদ একটি বিশেষ সেবার দাম। কোনকিছুর দাম নিয়ে কথা উঠলেই নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে আমরা সম-ধর্মী সেবার কথা বলছি; এবং সেবার তারতম্যের সাথে সাথে তার দামের হের-ফের হতে পারে; এবং জোর করে দুটো ভিন্নধর্মী সেবা একই দামে বাঁধার কোনও যৌক্তিকতা নেই। কোনও বাজারে দাম বেঁধে দেয়ার প্রয়োজন কেন হয় এবং তা কিভাবে কার্যকরী করা উচিত, সে ব্যাপারে সাধারণ যেসব ধ্যান-ধারণা রয়েছে, তা ঋণের বাজারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আরো একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় — প্রতিটি সেবার ন্যায় ঋণ-সরবরাহকে যেমন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা সম্ভব, তেমনি, ভর্তুকি দিয়ে তা গরীব-মুখী করা সম্ভব। বাজারের বিবিধ দিক গণ্য না করে এ'দুয়ের ভারসাম্য রাখা দুষ্কর।

ঋণ-সেবায় ভিন্নতা

সেবার গুণগত মান এবং সেবা-তৈরীর কলাকৌশল, উভয় বিচারেই সনাতনী ব্যাংকিং-এর সাথে ক্ষুদ্রঋণের পার্থক্য রয়েছে। একটি সনাতনী বাণিজ্যিক ব্যাংক নিজের অফিসে বসে জমা সংগ্রহ করে, এবং মূলত সেখানে বসেই বড় অংকের ঋণ অনুমোদন করে। জমা বৃদ্ধির জন্য প্রচার মাধ্যম ব্যবহার অথবা মাঝে-মধ্যে বিশেষ খদ্দেরকে আপ্যায়ণ করা, এবং ঋণ আবেদনকারীর অবস্থা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে কিছু সাইট-ভিজিট (পরিদর্শন) করা — এগুলোর মাঝেই মূলতঃ অফিস-বহির্ভূত কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। এসবের বিপরীতে ক্ষুদ্রঋণ ঋণগ্রহীতার দোরগোড়ায় ঋণের অর্থ পৌছে দেয়। প্রাথমিক দলগঠন, ঋণের

* নিবন্ধকার ইকনমিক রিসার্চ গ্রুপ-এর পরিচালক। মন্তব্য ও মতামত বিনিময়ের জন্য sajjadzohir@gmail.com এ ই-মেইল করুন।

সম্ভাব্যতা যাচাই, এবং সপ্তাহ-ভিত্তিক ঋণ-সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় গ্রহীতা পরিবারের নানাবিধ সামাজিক তথ্যাদির সাথে পরিচিতি একান্ত আবশ্যিক। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে, গোষ্ঠী-পর্যায়ে দূর্গতি এলে সদস্যদের পাশে দাঁড়ানো রীতিতে রূপ নিয়েছে। এসবের কারণে, ক্ষুদ্রঋণের আওতায় ঋণসেবা যত সহজে অন্য পাঁচটি সেবা-সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে (যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন, ইত্যাদি), তা সনাতনী ব্যাংকের ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

আরো লক্ষনীয় যে দুটো সেবা তৈরী ও সরবরাহ করতে ভিন্নজাতের উপাদান (জনবল সহ) প্রয়োজন, সেসব উপাদান মিশ্রনে ভিন্নতা রয়েছে, এবং ভিন্ন ক্রেতাগোষ্ঠীকে লক্ষ করে দু'জাতের সেবা সরবরাহ করা হয়। অর্থনীতির পরিভাষায়, প্রথাগত ব্যাংকিং-এর তুলনায় ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহে তুলনামূলকভাবে স্বল্পশিক্ষিত এবং সমাজ-সেবায় অধিক উদ্যোগী কর্মীর প্রয়োজন; এটা অধিক শ্রমঘন (অর্থাৎ, একই পরিমান ঋণ-সরবরাহে অধিক সংখ্যক কর্মী ব্যবহার করতে হয়); এবং প্রতিষ্ঠানিকভাবে বেশী বিস্তৃত। এসবের ফলে, সেবা উৎপাদনের খরচ ও সেবা-বিপনন থেকে প্রাপ্তিতে দু'জাতের ঋণ-সরবরাহে পার্থক্য অনেক – যার সীমিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো।

বাংলাদেশে তিন ধরণের বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে – সরকারী, দেশীয় ব্যাক্তি-মালিকানাধীন ও বিদেশী। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবেশিত তথ্যের গড় করলে দেখা যায় যে, শতকরা জমা ও ঋণের উপর সুদের হার সরকারী ব্যাংকের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৫% ও ১০%; দেশী বেসরকারী ব্যাংকে ৮.২৬% ও ১৩.৪৮%; এবং বিদেশী ব্যাংকে ৪.৭২% ও ১৩.৫৩%। লক্ষণীয় যে, শেষ দুটোর ক্ষেত্রে গড় সুদের হার প্রায় কাছাকাছি, যদিও বিদেশ থেকে প্রাপ্ত তহবিল রক্ষণাবেক্ষনের নিঃখরচায় বিশেষ দায়িত্ব পাওয়ায় জমা সংগ্রহে বিদেশী ব্যাংক-এর গড় খরচ অনেক কম। একইসাথে উল্লেখ্য যে, সরকারী ব্যাংকের লোকসান মেটানোর জন্য প্রতিবছর সরকারী ভান্ডার থেকে ভূর্তুকী দিতে হয়। অথবা, ভিন্নভাবে বললে, সরকারের ভূর্তুকী কর্মসূচী বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে যেয়ে দেশীয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের দেয় জমার উপর গড় সুদের হার অনেক কম। লাভের বিচারে যদি দাম কমানো সম্ভব হতো, তাহলে, বিদেশী ব্যাংকগুলোকে কম সুদে ঋণ দিতে বাধ্য করা যেত, যে প্রচেষ্টা পূর্বে সঙ্গত কারণে ব্যর্থ হয়েছে।

সমধর্মী সেবার বাজারে অংশ নেয়া সত্বেও উপরোল্লেখিত তিন ধরণের ব্যাংকের জমা ও ঋন-সুদের হারে বেশ পার্থক্য লক্ষণীয়। এদের তুলনায় ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা গ্রাম-পর্যায়ে স্বল্প-শিক্ষিত এবং স্বল্প ঋণে আগ্রহী মানুষের দোরগোড়ায় ঋণ পৌছে দিতে গিয়ে অনেক বেশী (সার্ভিস চার্জ বাবদ) খরচ করে। এদের মূলধনের কিছুটা সদস্য সঞ্চয় থেকে আসে, কিছু আসে স্বল্প-সুদে পি,কে,এস,এফ-এর কাছ থেকে, এবং অনেকেই অধিক সুদে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকেও ঋণ নেয়। অর্থাৎ, খরচের হেরফের রয়েছে; এবং একটি খরচের উপর নির্দিষ্ট মার্জিন ধরে একক কোনও সুদের হার বেঁধে দেয়ার যৌক্তিকতা কতখানি ভেবে দেখা প্রয়োজন। উপরন্তু, যে 'সাধারন ঋণ' সপ্তাহ-ভিত্তিক পরিশোধিত হয়, তার মাঝেও নানান পার্থক্য রয়েছে। যেমন, কেউ ৪০ সপ্তাহে ঋণ-পরিশোধ নিশ্চিত করে, কেউবা ৩৭ সপ্তাহে তা বেঁধে দেয়; এবং সময় অনুযায়ী ঋণ-পরিশোধ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভিন্ন-ধর্মী শিথিলতা দেখাতে পারে। ঋণ দেয়ার সময় বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে যে কর্তন হয় সে ক্ষেত্রেও ভিন্নতা লক্ষণীয়। এসবই বছর-ভিত্তিক কার্যকরী সুদের হার নির্ণয়ে জটিলতার উদ্ভব ঘটায়। [আকার বা চায়ের প্রকারভেদ চিহ্নিত না করে যদি কেউ কাপ-প্রতি চায়ের দাম বেঁধে দিতে চায়, তা কার্যকর আদতেই সম্ভব কি? বেঁধে দেয়া দামে বিক্রী করেও একজন বিক্রেতা ছোট কাপে বা নিম্নমানের চা দিয়ে লাভ নিশ্চিত করতে পারে; এবং এজাতীয় বিচ্যুতি রোধ করার নিচ্ছিদ্র কোনও তদারকী ব্যবস্থা নেই।] সনাতনী ব্যাংকিং খাতেও বিবিধ সার্ভিস চার্জের বাইরেও নানাবিধ ফ্যাইনেন্সিয়াল প্রোডাক্ট-এর নামে অনেক ধরণের ঋণের প্রচলন দেখা যায়, যেসবের অন্তর্নিহিত বাৎসরিক সুদের হার এক নাও হতে পারে। এতসব জানার পরও ক্ষুদ্রঋণের উপর বছর-ভিত্তিক সুদের হার বেঁধে দেয়া বেশ দুঃসাহসিক উদ্যোগ (!), যা এই খাতের বিকাশে বিকৃতি আনতে পারে।

প্রতিষ্ঠান বনাম ব্যাক্তিঃ দাম বাঁধার প্রভাব

ধরা যাক, বাৎসরিক ভিত্তিতে সুদের হার সর্বোচ্চ ২৭%-এ বেঁধে দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় সম্ভাব্য কয়েকটি অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। যদি ঋণ-সরবরাহকারী কম খরচে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে এবং যোগানের তুলনায় চাহিদার মাত্রা কমের ফলে বাজারে সুদের হার ২৭% এর কম হয়, সবই নিয়মে থেকে চলবে। যদি চাহিদা বেশী হবার কারণে (অথবা মূলধন বা সেবাদান খরচ বেশী হবার কারণে) বাজারে নির্ণিত সুদের হার ২৭% এর বেশী হয়, সেক্ষেত্রে একটি ঋণদানকারী সংস্থা ২৭% এর মাত্রা মানতে গিয়ে লাভ থেকে কিছুটা বঞ্চিত হবে; এবং সার্বিক সরবরাহে আপেক্ষিক ঘাটতি দেখা দিবে। অথচ, ঋণগ্রহীতা বেশী সুদ দিতে চাইবার কারণে ব্যাক্তি-পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূত লেন-দেনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত না করে সর্বোচ্চ দাম বাঁধার রীতি ব্যাক্তি-পর্যায়ে অবৈধ আয়ের পথ উন্মুক্ত করে এবং প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পুঁজি গড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যহত করে। শেষোক্ত বক্তব্য সাধারণভাবে বিনিময়যোগ্য সকল পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উৎস থেকে শুরু করে শেষপ্রান্তের ঋণ-গ্রহীতাকে গণ্য করে সার্বিক ঋণ-বাজারকে দেখলে কয়েকটি বিকল্প ঋণ-সরবরাহের পথ বিবেচনা করা যায়, যা অনেকাংশেই অনুমান-নির্ভর। এগুলো নিম্নরূপঃ

১। বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব ভান্ডার থেকে অথবা বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে –

(ক) সরাসরি বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থাকে মূলধন যোগান দিবে যা সেসব সংস্থা ঋণ-গ্রহীতাদের নির্দিষ্ট সুদে সরবরাহ করবে।

(খ) পি,কে,এস,এফ জাতীয় পাইকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থাকে মূলধন যোগান দেয়া হবে।

২। সনাতনী বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের জমা থেকে সংগৃহিত অর্থ থেকে ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থাকে ঋণ দিবে। অর্থাৎ, এক (শহর-কেন্দ্রিক) বাজারে নির্ধারিত সুদে ঋণ নিয়ে অন্য (গ্রামীন) বাজারে ঋণ-সরবরাহ করার দায়িত্বে থাকবে ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থাগুলো। এই প্রবাহ দুটো রুপ নিতে পারে – (ক) ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থা ভিন্ন অস্তিত্ব রেখে একাধিক উৎস থেকে ঋণ নেয়ার স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করবে; এবং (খ) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজেরাই সে দায়িত্ব কাঁধে নিবে যারফলে ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহে নিয়োজিত শাখা তাদের অঙ্গীভুত থাকবে।

৩। অতীতের ধারায় ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থাগুলো সদস্য সঞ্চয়, কিছু বাণিজ্যিক ঋণ ও প্রকল্প-ভিত্তিক কিছু অনুদানের সমন্বয়ে মূলধন সংগ্রহ করে ঋণ দিয়ে যাবে।

৪। যোগ্যতাসম্পন্ন ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থাকে আঞ্চলিক ব্যাংক হিসেবে কর্ম-পরিচালনার সুযোগ দেয়া যেন তারা জমা সংগ্রহ করে স্বল্প-খরচে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

উপরোক্ত বিবিধ পন্থার গুরুত্ব ভিন্ন। মধ্যস্বত্বাভোগী বাদ দিলে খরচ কমে, কিন্তু অব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি পেয়ে ঋণ-খেলাপী'র মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। সে কারণে ১ এর (ক)-এর পরিবর্তে (খ) চালু করার যৌক্তিকতা রয়েছে, যা একক সংস্থা হিসেবে পি,কে,এস,এফ-কে অনেক সম্পদশালী করেছে। এর পরিবর্তে যদি (২) নম্বর পথে চলা হয়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিঃখরচায় ঋণের জাল অনেক দূর বিস্তৃত করতে পারবে এবং তা থেকে অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ পাবে। যদি সুদের হার পর্যাপ্ত না হয়, পৃথক স্বত্বা নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থার পক্ষে টিকে থাকা দূষ্কর হবে। এর সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজেদের বিশেষ শাখা ব্যবহার করে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করতে পারে। সেক্ষেত্রে, এতদিনের গড়ে উঠা সংস্থাগুলো হয় বিলুপ্তির পথে যাবে, অথবা, তাদেরকে বাণিজ্যিক ব্যাংকে অঙ্গীভুত করতে হবে। কিন্তু দু'জাতের ব্যাংকিং ধারায় মৌলিক পার্থক্য থাকায় একই প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন মূল্যবোধের দুই শ্রেণীর কর্মচারী লালন করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। এটাও অনস্বীকার্য যে বিকল্প অর্থের উৎস না পেলে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছেই হাত পাততে হবে, এবং অধিক সুদের ফলে ঋণ-প্রবাহের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হবার সম্ভাবনা থাকবে। চতুর্থ পথে, নিজেরাই জমা সংগ্রহের মাধ্যমে সুলভে অর্থ যোগান করতে পারবে বিধায় এসব সংস্থাগুলোর পক্ষে তুলনামূলকভাবে কম সুদে ঋণ দেয়া সম্ভব হবে।

লক্ষের ভিন্নতা ও তা উপার্জনের ভিন্ন পথ

অতীতের ধারা (বর্ণিত ৩ নম্বর পথ) নিঃসন্দেহে বহুমুখী লক্ষ ও কর্মের মিশ্রনে অপাঙ্কতেয় হয়ে পড়েছিল। দারিদ্র্য বিমোচন ও বাণিজ্যিক দক্ষতা অর্জন-এর মধ্যকার বিরোধ আজও অমীমাংসিত। একইভাবে অমীমাংসিত রয়ে গেছে, কীভাবে ঋণ-কর্মসূচীকে দারিদ্র্য-বিমোচনের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যায়। এ প্রশ্নগুলো আলোচনায় এনে পরিসমাপ্তিতে কিছু প্রস্তাবনা রাখা হলো।

আলোচনার খাতিরে ধরা যাক যে দরিদ্র্য জনসাধারণের হাতে স্বল্পসুদে ঋণ দেয়া নিশ্চিত করতে পারলে তা দারিদ্র্য-বিমোচনের পথ সুগম করে। পূর্বে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান-বিন্যাসের ধারাগুলোর মাঝে দুটো ক্ষেত্রে সুদের হার কম হবার সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে - যখন মধ্যস্বত্বাভোগী অনুপস্থিত, এবং যখন ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থা নিজেরাই সুলভমূল্যে জমা গ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগযোগ্য মূলধন সংগ্রহ করতে পারবে। এর বাইরেও সরকারী রাজস্ব নীতির মাধ্যমে ঋণ-বাজারে দাম (সুদ) কমিয়ে রাখার জন্য প্রণোদনের ব্যবস্থা থাকতে পারে। আর পাঁচটা বাজারের ন্যায় এই প্রণোদন দেয়ার নানা পন্থা থাকতে পারে। তবে পি,কে,এস,এফ-এর মাধ্যমে সুলভে ঋণ-সরবরাহের এতদিনকার ব্যবস্থা কার্যকর মনে হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, সরকারকে সাধারণ কোনও আইন করে সুদের মাত্রা বাঁধতে হয়নি – ঋণ-দানকারী পাইকারী সংস্থা হিসেবে পি,কে,এস,এফ স্ব-উদ্যোগে তাদের 'পার্টনার সংস্থা'দের উপর সর্বোচ্চ সুদের শর্ত আরোপ করতে সমর্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক ঋণ-বাজারেও এজাতীয় শর্ত আরোপ-এর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

উপরে বর্ণিত প্রণোদন ব্যবস্থা যৌক্তিকতা পায় ঋন-বিতরনের মাধ্যমে দারিদ্র্য-বিমোচনের সম্ভাবনার কারণে। এবং এটা করতে যেয়ে ঋণ-সরবরাহের বাণিজ্যিক দিক আমরা ভুলে যাই এবং অতি আবেগের বশবর্তী হয়ে সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'দারিদ্র্য-বিমোচনের' বোঝা চাপিয়ে অদক্ষতার দিকে ঠেলে দেই। অদ্ভুতভাবে, দুটো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধারায় এই আবেগের প্রকাশ দেখা যায়। দারিদ্র্য-বিমোচনের কাজে কর্মরত দেখিয়ে এন,জি,ও/ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থাসমূহ নিজেদেরকে প্রচলিত করজালের আওতা থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট থেকেছে (অর্থাৎ কর না দিয়ে স্বল্পমেয়াদী লাভে আগ্রহী থেকেছে); এবং বিদেশী ঋণদানকারী/সাহায্য সংস্থা এব্যাপারে নৈতিক সহায়তা দিয়েছে। অপরদিকে, বিশেষ সহায়তা পায় বলে এসব সংস্থা'র কার্যপরিধি ও কার্যবিধির উপর শর্তাবলী আরোপের দাবি উঠেছে। যেমন, বিশ্বব্যাংকের মত সংস্থা বহু বছর এসব (এন,জি,ও

বা ক্ষুদ্রঋণ) সংস্থার দ্বারা পরিচালিত বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের বিরোধীতা করে এসেছে। ক্ষেত্রবিশেষে এর যৌক্তিকতা মেলে যখন ঐসব বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে লিপ্ত ব্যাক্তিমালিকানাধীন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান 'লেভেল-প্লেয়িং ফিল্ড'-এর অনুপস্থিতি দেখিয়ে প্রতিবাদ করে। এরই পাশাপাশি, আমরা দীর্ঘদিন যাবত ক্ষুদ্রঋণে সুদের হারকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তিকর এবং অনেকাংশে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য ও আলোচনা শুনে এসেছি। এসব বিতর্কের মাঝে সুষ্ঠ নীতিপ্রণয়ন থমকে দাঁড়িয়েছে – মূলতঃ একই কর্মকান্ডে উভয় বাণিজ্যিক ও সামাজিক সম্ভাবনার সহাবস্থান অস্বীকার করার কারণে। সেদিকে ঈঙ্গিত দিয়ে পরিশেষে কিছু প্রস্তাবনা করা হলো।

শেষ

পুঁজির বিকাশের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়ঃ (১) প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিক পুঁজির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, যা পরিবার-কেন্দ্রিক পুঁজির চাইতে অধিকতর সার্বজনীন এবং সে কারণে এর অংশীদারিত্ব থেকে প্রাপ্ত লাভ অনেকের মাঝে বিতরণের সম্ভাবনা বেশী; (২) কেবল ঋণ-বাজারে সীমিত থাকা অবস্থায় দারিদ্র্য-মুখী থেকে এই পুঁজির বাণিজ্যিকীকরণ (বাণিজ্য-পুঁজিতে রুপান্তর) ঘটেছে; (৩) অনেক ক্ষেত্রে ঋণ-বাজারের পরিধি পেড়িয়ে এই পুঁজি অন্যান্য অর্থনীতিক ও বণিজ্যিক কর্মকান্ডে অনুপ্রবেশ করেছে; এবং (৪) ঋন-গ্রহীতাদের যে বিশাল নেট-ওয়ার্ক গড়ে উঠেছে তা অন্যান্য বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে কাজ করেছে। আরো লক্ষণীয় যে, এসব বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে বাড়তি সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কর রেয়াত বা সম্পুর্ণভাবে করজালের আওতা থেকে মুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানিক অঙ্গনে সুষ্ঠ উত্তরনের নীতিমালা প্রণীত হয়নি এবং দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা ক্ষুদ্রঋণ-শিল্প আজ অনিশ্চয়তার সম্মুখীন। এই প্রেক্ষাপটে নীতি-নির্ধারকদের বিবেচনার জন্য নিম্নের প্রস্তাবঃ

১। যেসকল ক্ষুদ্রঋন-সংস্থা ঋণ-বাজারের বাইরে অন্যান্য বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছে, তাদের সেসব কর্মকান্ড আইনানুগ ভাবে ভিন্ন সংস্থা গড়ে নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা করা।

২। ক্ষুদ্রঋণ কর্মকান্ডকে বাণিজ্যিক কর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং এর প্রাসঙ্গিক উপখাতসমূহকে করজালের আওতায় আনা।

৩। প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন বা বিরাজমান নীতি সংশোধনের মাধ্যমে যোগ্য ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থাসমূহকে আঞ্চলিক ব্যাংকে রুপান্তরের প্রক্রিয়া যথাশীঘ্র শুরু করা। এ কাজটি করলে, উল্লেখিত দ্বিতীয় (২) কাজটিও সহজ হবে।

৪। পূর্বের অনুচ্ছেদে বর্ণিত কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে ক্ষুদ্রঋণের থেকে প্রাপ্ত সামাজিক লাভ দৃশ্যত ব্যবসায়িক লাভের অধিক, এবং সে কারণেই এই খাত প্রণোদন পাবার দাবী রাখে। আঞ্চলিক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে জমার ভিত্তিতে সুলভে মূলধন যোগান কতদূর সম্ভব তা দেখার ব্যাপার। ততদিন, পি,কে,এস,এফ-জাতীয় পাইকার সংস্থার মাধ্যমে সুলভে মূলধন যোগান ও তাদের মাধ্যমে সুদের হার প্রভাবান্বিত করা অধিকতর কার্যকর হবে।

সবশেষে একটি পুরোনো অথচ প্রাসঙ্গিক কথা না বললেই নয়। আমাদের দেশে ঋণ ও সাহায্যের নামে যে অর্থ বিদেশী সংস্থা থেকে আসে এবং (অনেকক্ষেত্রে) বিদেশী সংস্থা দ্বারা ব্যবহৃত হয়, তা (ই,আর,ডি,-এর সাথে করা) একটি চুক্তির ভিত্তিতে কর-মওকুফের সুবিধা পায়! এত উঁচু পর্যায়ের গলদ যেখানে দৃষ্টির আড়ালে রয়ে যায় এবং এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুললেও যখন কোথাও উত্তর মেলে না, এন,জি,ও/ক্ষদ্রঋণ খাতে যা ঘটছে, তা নিতান্তই নগণ্য মনে হয়। এরপরও, ইতিবাচক পরিবর্তন কোথাও না কোথাও থেকে শুরু করা জরুরী।